দিনেশ দাস ঃ কবি ও শিক্ষক

সাগর বিশ্বাস (হায়দ্রাবাদী)

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩। ঠিক শতবর্ষ আগে চেতলার পাশে আলিপুরে জন্মেছিলেন কাস্তের কবি দিনেশ দাস। ছয় দশক আগে চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে, বাঙলা ভাষা এবং কবিতাকে ভালোবাসতে আমাদের শিখিয়েছিলেন প্রিয় শিক্ষক দিনেশ দাস। শিক্ষকতা তখনও বাণিজ্যিক হয়ে ওঠেনি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের উপর শিক্ষকদের বেতনও ছিল না। মানুষ গড়ার কারিগররা একটি আদর্শ সামনে রেখে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতেন, ছাত্ররা যেন যথার্থ মানুষ হয়। স্কুলের ছুটির পর, ছুটির দিনে উঠতি লেখক ছাত্রদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। নবম, দশম শ্রেণিতে তিনি বাঙলা পড়াতেন। এগারোটা সেকশান থেকে বাঁধাই খাতায় হাতে লেখা ম্যাগাজিন বেরোত। সাহিত্য এবং শিল্পের অঙ্কুর যাতে জীবনীশক্তি পায় তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি শিক্ষক দিনেশ দাসকে। কিছু মাস্টার মশাই বাড়তি আয়ের জন্য কোচিং ক্লাস খুললেন, দিনেশ দাস বিনা পারিশ্রমিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার প্রিয় ছাত্রদের নিয়ে সাহিত্য আলোচনা করে চলেছেন।

পূর্ববঙ্গে অজ পাড়াগাঁয়ে জন্মেছিলাম। আমাদের অঞ্চলের বিশেষত্ব ছিল ছড়াকাটা। মেয়েলি কথাবার্তা এমনকি ঝগড়াতে ছড়া চলত। আমাকেও ছড়াকাটা অভ্যাস প্রভাবিত করে। সেখানে একটা কদম গাছে বর্ষাকালে কে যেন লম্বা বাঁশ ঠেস দিয়ে রেখেছিল। বছর পাঁচেকের শিশু, বাঁশ ধরে নাড়ছি আর কদম ফুল পড়ছে। প্রথম ছড়ার প্রকাশ ঘটল—

'সখিরে কদম গাছে বাঁশ উঠেছে, / বাঁশের মাথায় ফুল ফুটেছে, / বাঁশে দিলাম নাড়া, / ফুলের দফা সারা।'

কলকাতা এসেই ১৯৪৮ সালে চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে ভর্তি হই। ছড়া থেকে কবিতা লেখায় উত্তরণ ঘটেছে। কবিতাও ছড়া ভিত্তিক। আমাদের হেড মাস্টার ছিলেন শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলের পাশে থাকতেন সাহিত্যিক বিমল মিত্র। দু'জনের একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। দু'জনকে নিয়ে ছড়া লিখি। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিয়ে হাস্যকৌতুক ঠিক কিনা, এবিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে বির্তক শুরু হয়। আবার সেকশান ম্যাগাজিনে 'শিখা' শীর্ষক কবিতা নিয়ে ক্লাস মনিটরের সাথে মতান্তর। বিষয়টা গড়ায় দিনেশ স্যারের মতামতের জন্য। তিনি তো কোনো রকম মন্তব্য করলেন না, উপরন্তু কবিতার খাতা নিয়ে প্রত্যেক রবিবার সকাল এগারোটায় চেতলাহাটের পাশে আফতামক্স লেনের বাসায় যাবার জন্য বললেন। তখন আমি নবম শ্রেণি। জীবনানন্দ প্রিয় কবি। আঁশফল, হুডুক্কু মাছ, তক্ষক, 'ভাঙাহাটের চালায় বনটিয়ার নীল ডিম' শব্দকল্প দিয়ে খাতা ভরছি। একদিন বললেন, "শৈশব স্মৃতির বাইরে বিরাট বিশ্ব আছে। সেখানে দৃষ্টি থাকলে বহু উপাদান পাওয়া যায়। শরৎবাবু লেখায় প্রকৃতি থেকে মানুষের প্রাধান্য দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যকে কল্পনার মিনার থেকে মাটির পৃথিবীর পরে তিনিই দাঁড় করিয়েছেন। মানুষ নিয়ে লিখতে চেষ্টা করো।" মুলকরাজ আনন্দের উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ

'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' পড়েছি। চা বাগিচার দৃশ্য চোখের সামনে। লিখে ফেললাম, 'পাহাড়ী সন্ধ্যা'। কবিতা পড়ে বললেন, "ভালো হয়েছে, চা-বাগানে না গেলে এসব কথা জানা যায় না। কোথায় গিয়েছিলে?" বললাম "মুলকরাজ আনন্দের বই পড়ে লিখেছি।" এই বয়সে বাঙলা সাহিত্যের গণ্ডি ডিঙিয়ে অন্যভাষার সাহিত্য চর্চা করছি দেখে আরও খুশি হলেন। কবিতাটা স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনে ছাপানো হল। আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতা কাব্যের শিক্ষাগুরু দিনেশ দাসের সান্নিধ্যে। ১৯৫৩ সাল। বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম প্রকাশের সাথে বই বাজারে অন্য লেখকদের বই বিক্রিতে ধস নামল। প্রচার শুরু হল, অন্য লেখকের অপ্রকাশিত ছোট গল্প পড়ে তিনি লিখেছেন। সাহিত্য সভায় দিনেশ স্যার, বিমল মিত্রকে সমর্থন জানালেন এবং ছাত্রদের এই ধরনের নোংরামি থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিলেন। স্কুল, কলেজের পরে কর্মক্ষেত্র হল দুর্গম হিমালয়। আমার মেজোভাই ছিল একই স্কুলের ছাত্র। তার কাছ থেকে আমার খোঁজ খবর নিতেন। কবি কালিদাস রায় 'ছাত্রদল'-এ লিখেছেন 'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, / মালিকা পরিলে গলে, প্রতিফুলে কেবা মনে রাখে।' ব্যতিক্রম আছে বৈকি। কবি শিক্ষক দিনেশ দাস তাঁর ছাত্রদের সাহিত্য ভাবনার বীজে যে বারি ও উত্তাপ জুগিয়েছিলেন, উত্তর জীবনে তার অনেকেই মহীরুহ না হ'ন সৎ সাহিত্যসেবী হয়েছেন।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়, বিশেষ ভাবে বিশ শতকের ত্রিশের দশকটা বাঙলা তথা ভারতের শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতির মোড় ফেরার মাইল ফলক। দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের দিকে বিকল্প ভাবনার ঢেউ উঠল। যে কাজটা মার্কস লেনিনের অনুগামীরা তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝাতে পারছিলেন না, ১৯৩১ সালে মানববাদী রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' সেই কাজ করল। সুভাষচন্দ্র বোস সহ তাবড় তাবড় গান্ধীবাদীরা বিশ্বের শোষণ মুক্ত সমাজের রূপরেখা দেখলেন সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের মধ্যে। দিনেশ দাস প্রথম জীবনে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের (১৯২২-১৯৮৭) মতো গান্ধীবাদী ছিলেন। পিতা হৃষীকেশ দাস ইংরেজ সরকার কর্মী, মা কাত্যায়নী আদর্শ গৃহিনী। একমাত্র ছেলে উচ্চশিক্ষা পেয়ে যে সরকারি উচ্চপদে আসীন হবে এটাই ছিল তাঁদের আশা। পুত্র দিনেশ, বিদেশি শাসকের গোলামি করবে না এবং কলকাতায় থাকলে নানা অনুরোধ উপরোধের সম্মুখীন হতে হবে সেটা নিশ্চিত। তিনি চলে গেলেন উত্তরবাঙলার চা-বাগানে, ম্যানেজারের বাড়ির ছেলে মেয়েদের গৃহশিক্ষক হয়ে। চা-বাগানের জীবন তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ বদলে দিল। ১৯৩৬-এ কলকাতায় ফিরে এসে বললেন, 'একটি নতুন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হলুম, যার নাম কমিউনিজম।' বস্তুবাদী চিন্তাধারা তাঁর জীবন ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হলেও তিনি কোনো দলের সদস্য ছিলেন না এবং ছাত্রদের স্বাধীন মতামতে কোনও দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করতেন না। শুভোঠাকুর ও বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অগ্রগতি' পত্রিকায় তাঁর কবিতা 'প্রথম বৃষ্টির ফোটা' প্রকাশ পায়। ১৯৩৪ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শ্রাবণে' কবিতা। দিনেশ দাসকে বিখ্যাত করেছিল তাঁর 'কাস্তে' কবিতাটি। প্রথম চার লাইন বাদ দিয়ে অন্য লেখকরা দিনেশ দাসকে নতুন যুগের অগ্রদূত আখ্যা দেন। এই কবিতাটি ইংরেজের রক্তচক্ষুর

ভয়ে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। অরুণ মিত্রের প্রচেষ্টায় ১৯৩৮-এ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল :

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো / কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু! / শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো / কাস্তেটা শান দিও বন্ধু, / বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি / তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে? / চাঁদের শতক আজ নহে তো / এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শোষণের সাথে সামন্ততন্ত্রের গাঁটছড়া, কৃষকের সংগ্রামী ভূমিকা, শহর থেকে গ্রাম্য জাগরণের প্রাধান্য, দিনেশ দাসের আগে সবাই এড়িয়ে গেছেন। কবি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একযোগে কাস্তের মধ্যে এ যুগের চাঁদ দেখতে পেলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান : 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাইরে।' শ্রীহট্ট থেকে মণিপুর হয়ে আই.পি.টি.-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতে। কবি দিনেশ দাস হলেন 'কাস্তের কবি।' কবিতার জগতে পা রেখে এমন সম্মান আর কারো ভাগ্যে জোটেনি।

শরৎচন্দ্র বিদায় নিলেন। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ। রোগশয্যায় শুয়ে বিশ্বকবি লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা রচনায় হাত দিলেন। ১৯৪১ সালে প্রথম বইটি প্রকাশ হয় 'বাংলা কাব্য পরিচয়।' স্থান পায় দিনেশ দাসের 'মৌমাছি' কবিতাটি। 'জীয়ন্ত ফুলের ঘ্রাণে... আমার ঘরেতে ওড়ে এক বুনো মৌমাছি।' আঠাশের তরুণ অশীতিপর জ্ঞান বৃদ্ধের সাথে শেষ সংযোগ। এরপরে এক পঁচিশে বৈশাখে দিনেশ দাস লিখলেন 'প্রণমি' কবিতাটি :

'আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা—
কোনখানে রাখবো প্রণাম।'

কলকাতায় বন্ধু হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। দু'জনে যোগ দিলেন 'ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'-এ। কেরানির কাজ পছন্দ হল না। দু'জনেই কাজ নিলেন 'দৈনিক কৃষক' (১৯৪০-৪৬) পত্রিকায়, পরে 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় (১৯৪৭)। যুদ্ধ, মেদিনীপুরে সামুদ্রিক ঝড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু (১৯৪২), দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), দেশভাগ (১৯৪৭), গান্ধীজির মৃত্যু (১৯৪৮) কবি দিনেশ দাসের লেখনিতে তার প্রতিধ্বনি উঠেছে। পূর্বাশা প্রকাশনী থেকে 'কবিতা (১৯৩৭-৪১)' নামে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৯৪২-এ প্রকাশ হয়। 'ভুখা মিছিল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয় ১৯৪৪-এ। গান্ধীজির মৃত্যুতে লিখলেন, 'ভস্ম তোমায় জড়িয়ে নিলাম / ছড়িয়ে দিলাম নীল, আমাজান, হোয়াংহোতে।'

কাব্য এবং শিক্ষা মনস্কতা দিনেশ দাসের চিরসঙ্গী ছিল। ছায়াছবির গীতিকার এবং সহ-পরিচালক হয়েও ছেড়ে দিলেন। দেশ ভাগের পর কলকাতা ছেড়ে হাওড়া জেলার দেউলপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি নেন। এক বছরের মধ্যেই তার জন্মস্থানের কাছে আদিগঙ্গার ধারে চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ আসে এবং সমগ্র কর্মজীবন এই স্কুলে অতিবাহিত করেন।

১৯৫৪-তে তাঁর 'অহল্যা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর কিছু দিন আগে জীবনানন্দ দাশ এক চিঠিতে জানালেন, "অহল্যাকে আপনি আধুনিক যুগের বা সনাতন পৃথিবীর ব্যথিত, শিলীভূত প্রাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যে পরিচয় দিয়েছেন, তা অপূর্ব।" কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন, "আমি চিরদিনই আপনার ভক্ত। 'অহল্যা' সেই ভক্তি আরো বাড়িয়ে দিল।"

'দিনরাত্রি বর্ষ মৃগ নক্ষত্রের শতাব্দী ধরে
অহল্যার কান্না শুনি জীবন্ত পাথরে'

ছাত্র পড়িয়ে, খাতা দেখে, সংসার চালিয়ে খুব বেশি বই লেখেননি দিনেশ দাস। 'কাচের মানুষ' (১৯৬৩), 'অসংগতি' আর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কবিতা সংগ্রহ', অবশেষে 'রাম গেছে বনবাসে' (১৯৮২)। তিনি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের সময় ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যুক্ত ছিলেন। আশ্চর্যভাবে দিনেশ দাসকে প্রথম সম্মাননা জানায় সিনেমা এবং বিনোদন পত্রিকা 'উল্টোরথ' ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। সেটা আবার বিভিন্ন সময়ে লেখা কবিতা সংগ্রহ 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (প্রথম পর্যায় ১৯৬২, দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭০)। এর পরে আমন্ত্রণ পান দিল্লিতে সর্বভারতীয় 'জাতীয় কবি সম্মেলন' ১৯৬১, '৭৫-এ। নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, নজরুল অ্যাকাডেমি তাকে সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত করে। শেষ পুরস্কার 'রাম গেছে বনবাস'-এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮২)।

কবি দিনেশ দাসের হাতে গড়া একজন ছাত্র হিসেবে, শিক্ষকের মূল্যায়ন আমার পক্ষে অনুচিত শুধু নয়, অবাস্তব। কোনো কোনো সমালোচক তাঁর প্রথম যৌবনে লেখা, 'কুমারীর স্বপ্ন', 'সবুজ দ্বীপ' বা 'পাটগাছ' কিংবা 'ভাঙাচাঁদ' পড়ে কবিকল্পে দুর্বলতা লক্ষ করেন, তাঁরা 'অন্ধের হাতি' দর্শন করেন। জীবনানন্দ দাশ যদি 'বনলতা সেন' ছাড়া অন্য কবিতা না লিখতেন, দিনেশ দাস যদি 'অহল্যা' ছাড়া অন্য কবিতা না লিখতেন, কাব্যজগতে তাঁদের ভাবমূর্তি চিরদিন অম্লান থাকত।

১৩ মার্চ ১৯৮৫ দিনেশ দাস প্রয়াত হন। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ছুটেছিলাম। প্রিয় শিক্ষকের শেষ দর্শন পাইনি। কবি পুত্র শান্তনুকে দেখলাম। পরবাসী মানুষ, কে চেনে? কবি আশিস সান্যাল জানাল, শান্তনু এখানে থাকে না। শান্তনু দাস ভালো কবিতা লেখে। আমার লেখা 'সিন্ধু পারের পাখি' দিনেশ দাসকে উৎসর্গ করেছিলাম। বিদেশি কবিতার অনুবাদ কীভাবে করতে হয় তিনিই শিখিয়েছিলেন।

শতবর্ষ শেষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

কাস্তের কবির শতবর্ষ শেষ। / আমরা কড়া নাড়ি / বন্ধ দরজায়। / জীবন-মৃত্যুর হ্রদ, / ফসফরাস জ্বলে আর নেভে, / পুড়ে যায় পার্থিব শরীর। / অশরীরি স্মৃতি যায় ভেসে / সূক্ষ্ম পথে বৈতরণী জলে। ❑